

## মূল্যবোধের অবক্ষয়, ভেঙ্গে পড়া সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

দায়ী কে?

আজকাল অহরহ শুনতে পাচ্ছি সমাজপতি আর রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের বক্তৃতা বিবৃতিতে যে বর্তমানে সমাজ আর রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো থেকে মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক আচার-আচরণ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, বাকস্বাধীনতা, শৃংখলাবোধ, সমঝোতাবোধ, সত্যবাদিতা, সৎ এবং ন্যায়ের পথে থাকার মানুষিকতার মতো মূল্যবোধগুলো উধাও হয়ে গেছে, তাই ধ্বংসে পড়ছে সমাজ ও রাষ্ট্র। কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছে ভক্ষরাই রক্ষক (!) হবার চেষ্টা করছেন।

যে কোন মূল্যবোধ মন-মানুষিকতা ও চেতনা থেকে উৎসারিত এক ধরনের অনুভূতি ও ভাবনা যা ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের প্রতিক্ষেপে অনুশীলণ এবং চর্চার মাধ্যমে ক্রমে বিকশিত হয়ে পরিণত হয় মূল্যবোধে। যখন কোন মূল্যবোধ বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে তখন সেটা সামাজিক মূল্যবোধ হিসাবে পরিগণিত হয়। ক্রমান্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধ জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। একইভাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সার্বজনীনভাবে গৃহিত মূল্যবোধগুলোকে বলা হয় মানবিক মূল্যবোধ।

বাংলাদেশের জনসমষ্টির ইতিহাস এই সত্যই বহন করে যে উল্লেখিত মূল্যবোধগুলো ছাড়াও আরও অনেক মানবিক মূল্যবোধ তাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসাবে বিশ্ব পরিসরে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে প্রাচীনকাল থেকেই। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে আমার প্রশ্ন- দেশের তথাকথিত সুশীল সমাজের বংশজাত সমাজপতিরা যারা দেশের জনসংখ্যার এক শতাংশও নন তারা নতুন করে জনগণকে কোন মূল্যবোধের ছবক শেখাবার চেষ্টায় প্রাণপাত করছেন আদাজল খেয়ে? প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, তারা যাই বলছেন সেটা বোধগম্য নয়। কারণ অভ্যাস অনুযায়ী তারা স্পষ্ট করে কখনোই কিছু বলেননি; বলছেনও না। তদুপরি যুগ যুগ ধরে এ দেশের মানুষ যে সমস্ত মূল্যবোধ সজতে লালন করে এসেছেন তার সাথে মিলছে না সমাজপতিদের ব্যাখ্যা। তাদের নিজস্ব সংজ্ঞার প্রতিফলনও ঘটছে না তাদের কার্যকর্মে। ফলে তাদের বাগম্বড়তা গ্রহণযোগ্যতাও পাচ্ছে না। জনগণ তাদের দেখছেন মতলববাজ সুযোগসন্ধানী হিসাবেই। তারপরও চলেছে একটানা মগজ ধোলাই এর প্রচেষ্টা। বলা হচ্ছে সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বিতাড়িত হয়েছে সব মূল্যবোধ। কথাটা ঠিক নয়। এখনো দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা জনগোষ্ঠীর নিরানুর্ব্বই শতাংশ, তাদের চরিত্রে ও তাদের কাজকর্মে ঐসমস্ত মূল্যবোধের অনেকিছুই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এটা আজ দিবালোকের মতই স্পষ্ট এবং সত্য যে, স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে আজঅদি সমাজপতি ও রাজনীতিবিদ গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে গুরু করে সাধারণ মানুষের পরিবার পর্যন্ত সবকিছুই ছলে-বলে-কৌশলে হাতের মুঠোয় কজা করে নিয়ে নিজেদের দুখে আম ধোয়ানোর জন্য এবং গোষ্ঠী স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনকানুন বানিয়ে যে এক উদ্ভট সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলয়ে যে অবকাঠামো গড়ে তুলেছেন সেখানে কোন মূল্যবোধেরই বালাই নেই। নিয়ন্ত্রিত দেশ ও সমাজে পাতানো খেলার রাজনীতির ছকে ক্ষমতার হাত বদল অবশ্যই হয়েছে কিন্তু ক্ষমতা আজঅদি রয়ে গেছে ভাই-ভাতিজাদের খপ্পরেই। তাই ঐ সমস্ত মহারথীদের নিয়ন্ত্রাধীন সমাজের প্রতিক্ষেত্রের ক্ষমতা বলয় ও রাষ্ট্রীয় প্রশাষনের অবকাঠামো থেকে যদি সব মূল্যবোধ উধাও হয়ে গিয়ে থাকে তার জন্য দায়ী স্বয়ং তারাই। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে যদি পচন ধরে তবে সেটা সমাজে সংক্রমিত হবে সেটাইতো

স্বাভাবিক। তাই এই অধঃপতনের দায়ভার অন্য কারো উপর চাঁপিয়ে দেয়ার অবকাশ তাদের নেই বরং নৈতিকতা ও লজ্জা-শরমের ছিটেফোঁটাও যদি তাদের থেকে থাকে তবে গলাবাজি না করে যুক্তিসঙ্গত কারণে এদের সবারই উচিৎ জনতার আদালতে স্বেচ্ছায় আসামির কাঠগড়ায় নিজেদের দাড় করাণো। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী!

এ বিষয় নিয়ে বক্তৃতা-বিবৃতি, লেখালেখি, মিটিং-মিছিলের অন্ত নেই। এ সবকিছুরই উদ্দ্যোক্তা তথাকথিত সুশীল সমাজের চাইরাই। যারা ঐ সমস্ত সভা-সমাবেশে আসে তারা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না। দেশের একজন মুদি দোকানদার, রিকশা চালক, ভিক্ষুক, দিনমজুর এমনকি সমাবেশের আয়োজনকারীরাও জানেন এরা সব ঠিকাদার কর্তৃক ভাড়া করা লোকজন। জঠর জ্বালায় জ্ঞানশূণ্য এই লোকজন আসে এক বেলায় অনু সংস্থানের মত টাকার বিনিময়ে। বজ্রা কে কি বলছেন সেটা শোনার আগ্রহ তাদের থাকে না; দু'টো টাকা হাতে নিয়ে বাড়ি ফেড়ার অপেক্ষায় তারা সময় গুনে চলে। বিদেশের ধামাধরা দেশীয় মহারথীরা সবাই জানেন কোন সভ্য সমাজে দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে টাকার বিনিময়ে বিশাল জনসভার কোন প্রচলন নেই। ঐ ধরনের সমাজে জনসভা মানে জনতার আদালত। সেখানে নেতানেত্রীদের দাড়াতে হয় কাঠগড়ায়। উপস্থিত জনতার প্রশ্নবানে জর্জরিত হতে হয় তাদের, বলির পাঁঠার মত সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হন তারা। শুধু একতরফাভাবে গালভরা বক্তৃতা দিয়ে হাততালি কুড়িয়ে কেটে পরার অবকাশ নেই সেখানে। এমনটি আমাদের মত দেশে ঘটে না; কারণ কায়মি স্বার্থের প্রতিভু সমাজপতি ও রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য কৃত ন্যাক্কারজনক কার্যকলাপকে জনসমর্থিত কার্যকলাপ হিসাবে হালাল করে নেবার জন্যই এই ধরনের জনসভার আয়োজন করে থাকেন। এই পটভূমিকায় সংক্ষেপে অতি সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সহনশীলতার মত মূল্যবোধগুলো রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঠামোতে কি করে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

অতীতে মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে কখনোই ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় গিয়ে অপকীর্তিকে বৈধ করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কোন অবকাশ ছিল না যেমনটি আজ হচ্ছে। মানবাধিকার মানে হচ্ছে সবক্ষেত্রে সমগ্র জনগোষ্ঠীর সমান অধিকার তথা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় সম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, নৈতিকতা, আইন-আদালত এবং বাটার ক্ষেত্রে সমান অধিকার। কোন অসম সমাজে অতীতেও এই অধিকার জনগণকে দেয়া সম্ভব হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। আজকের বাংলাদেশে নিরানুর্বই শতাংশের জনগণের বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা – জীবিকার মাধ্যম, শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, জাতীয় সম্পদ সবকিছুই কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে দেশের এক শতাংশ লোকের মুঠোয়। পরিণামে আজ তারাই হয়ে উঠেছে বাকি নিরানুর্বই শতাংশের ভাগ্যবিধাতা। এ ধরনের অস্বস্তিকর বৈষম্যমূলক সমাজে শুধু মানবাধিকার, গণতন্ত্র কেন কোন মূল্যবোধই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিশেষ করে এক শতাংশের প্রতিনিধিত্বকারী সমাজপতিদের দ্বারা। কারণ, সেক্ষেত্রে তাদের গোত্র স্বার্থ টিকিয়ে রাখা হয়ে পড়বে অসম্ভব। জনসাধারণের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করে জাতীয় সম্পদ আত্মসাৎ করেই আজ যারা বিভ্রাটালী ও পেশীশক্তির অধিকারী সমাজপতি তাদের মাধ্যমে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে কোন গুণগত পরিবর্তনের আশা বাতুলতা মাত্র। এই সত্যকে উপলব্ধি করার সময় এসে গেছে।

বর্তমানকালে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের যে চেহারা সেটা কুৎসিত, বিভিত্তস, লোমহর্ষক তাই কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ঔপনিবেশিক শোষকদের পোষ্যপুত্রদের চাপিয়ে দেয়া বিকৃত মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের জাঁতাকলে আর কতকাল পিষ্ট হবে দেশবাসী? দীর্ঘকালের পরিক্ষীত মূল্যবোধের সাংস্কৃতিক

ঐতিহ্য রয়েছে আমাদের। এ মাটির গণমানুষেরাই তাদের চিন্তাচেতনা, বাস্তব পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতা, প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা, সুখ ও সমৃদ্ধির নিরিখে মানবাধিকার, গণতন্ত্রসহ অন্যান্য মূল্যবোধের রূপরেখা করেছিলেন বহু যুগ আগেই, যার অনুশীলন ও চর্চার ফলে আদি বাংলা একটি সভ্য, সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল জাতি ও জনপদ হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছিল সেই সময় যখন ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের পরিচয় ছিল অসভ্য, দসু-হারমাদ হিসাবে; তাই বাংলাদেশের জনগণের মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন কোন ছবকের প্রয়োজন নেই। যা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে যারা আজ কজা করে নিয়েছে জবরদখলের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণের পরিসমাপ্তি ঘটানোর লক্ষ্যে নিরানুর্বই শতাংশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে অতীত ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের আলোকে সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র বদলিয়ে দেবার প্রত্যয় নিয়ে। সমাজের প্রতিক্ষেত্রের প্রতিটি পর্যায়ে নিজেদের জবাবদিহিতা মূলক অংশীদারিত্ব কয়েমের মাধ্যমে একটি সুসম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব পালনের আন্দোলনে। এটাই হবে প্রকৃত অর্থে ‘বাঁচাও বাংলাদেশ’ আন্দোলন। পরিবর্তিত সেই অবকাঠামোতে তৃণমূল থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই অনুশীলন ও চর্চা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে আমাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা এবং অভিজ্ঞতা থেকে অনুশ্রিত মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও অন্যান্য মূল্যবোধ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভ্রাটের কজাপাটির অর্থবল ও অস্ত্রবলের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতদৃষ্টিতে এ কাজটি কঠিন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কাজটি অসম্ভব নয় মোটেও। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হাড্ডিসার, অভুক্ত আধপেটা মানুষ বিভক্তির কারণে আজ দুর্বল। কিন্তু তারা যদি লুটেরা-বাটপারদের ভাষা বুঝে নিজেদের স্বার্থে দেশকে বাচানোর জন্য ঐক্যবদ্ধ হন তবে তাদের রোষের অনলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে কজাপাটির দুর্গ তাদের ঘরের মতোই। এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। কয়েমী স্বার্থবাদী লুটেরাদের কলাকৌশল, ছলনা, দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত হওয়া বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে মোটেও কষ্টসাধ্য নয়। আজকের প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের এমনকি একজন সাধারণ ব্যক্তিও ইচ্ছে করলে এ জ্ঞান লাভ করতে পারেন। যারা এই ধরনের মানুষিকতা ও জ্ঞানের অধিকারী তাদের সততা, কমিটমেন্ট ও নিষ্ঠা পরখ করে নিয়ে তাদেরকে কাঙ্ক্ষারী হিসেবে গ্রহণ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আজকের দুর্বল হাড্ডিসার জনতা এক অপ্রতিরোধ্য, অপরায়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই। এই সত্য উপলব্ধি করার জন্য বিগত কয়েক বছরের জাতীয় ইতিহাসই যথেষ্ট।

তবে সাফল্যের জন্য অবশ্যই সর্বপর্যায়ে নেতৃত্ব থাকতে হবে জ্ঞানী ও যোগ্য প্রতিনিধিদের হাতেই। তারাই নির্ধারণ করবেন নীতি-আদর্শ এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্বও থাকবে বিবেচনীয় শাসন ব্যবস্থায় তাদের ও জনগণের উপরেই। সাফল্য ও ব্যর্থতার দায়-দায়িত্বও বহন করতে হবে তাদেরকেই। এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সচেতনতা ও আন্তরিক ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। ধোঁকাবাজির ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে গড়ে তুলতে হবে সত্যভিত্তিক গণআন্দোলন। সেখান স্থান পাবেনা বর্ণচোরারা। এ ধরনের গণজোয়ারের মধ্য থেকেই সৃষ্টি হবে নতুন প্রজন্মের ত্যাগী নেতৃত্ব। তারা হবেন জনগণের সাথী; মুনিব নয়। নির্ধারিত নীতিমালার বাস্তবায়নের জন্য নিঃস্বার্থ আন্তরিকতায় জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাবেন। তাদের থাকবে স্বচ্ছ জবাবদিহিতার দায়বদ্ধতা। বিবেচনীয় রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয়ভাবে জনগণই হবে প্রগতি ও উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। সরকার হবে তাদের কাজের সহযোগী। কেন্দ্রের প্রশাসনিক ক্ষমতা হবে সীমিত। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা, আইন-শৃংখলা বজায় রাখা, সামাজিক স্থিতিশীলতার নিশ্চিতকরণ, বৈদেশিক সম্পর্কের নীতি

নির্ধারন, মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণ, ডাক ও যোগাযোগ বিভাগকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা বহাল করাই হবে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। প্রশাসনিক আমলারা সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ ধরনের বিকেন্দ্রীয়, প্রতিনিধিত্বশীল জবাবদিহিমূলক সরকার ও সমাজকাঠামো যার প্রতিটি পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ যদি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তবেই গড়ে উঠবে সুসম সমাজ ব্যবস্থা ও গণমুখী রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। আর সে ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজেই সম্ভব হবে প্রকৃত অর্থে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রসহ অন্যান্য মূল্যবোধের অনুশীলন ও অবাদ চর্চা। যা ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিক্ষেত্রের সর্বস্তরে। এভাবেই পুনরায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

পরিশেষে দেশবাসীর কাছে সবিনয় অনুরোধ, একই গোয়ালের গরুদের কাছ থেকে উদ্ভট ফর্মুলার কতো কথাইতো শুনলেন আর অনেকের মাধ্যমে আজন্দি ঐসমস্ত ফর্মুলার বাস্তবায়নের তিক্ত অভিজ্ঞতার অভিশাপও বহন করলেন। দয়া করে এবার আমার এই সাদামাটা অগোছালো কথাগুলোর প্রতি একটু মনোসংযোগ করুন। যৌক্তিকতা যাচাই করে দেখুন। কোন চাওয়া-পাওয়ার লোভে আমার এ অনুরোধ নয়। অনামিশার গোলক-ধাধাঁর মাঝ থেকে বেরুবার কোনো পথ যদি এই প্রতিবেদনে খুঁজে পান তবেই ভাববো সার্থক হয়েছে আমার এই লেখা।

*হিমেল রহমান (হিমু)*

*ক্যালিফোর্নিয়া*

himu\_ca@hotmail.com